জনগণ দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সুফল পাচ্ছে না কেন?

আ হ সা ন   মো হা ম্ম দ

আশির দশকের মাঝামাঝি একজন জনপ্রিয় তাফসীরকারক দুর্নীতিকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁর বিশাল তাফসীর মাহফিলগুলোর মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন শুরু করেন। তৎকালীন দুর্নীতিবাজ স্বৈরশাসক এতে ক্ষীপ্ত হয়ে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রূপ দেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। এ কৌশল সফল হয়। ফলে পরবর্তী দশ বছরেরও বেশী সময় দুর্নীতি বিষয়ে তেমন কোন উচ্চ-বাচ্চ হয় নি। ২০০১ সালে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশকে বিশ্বের সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে ঘোষণা করার পর মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হতে থাকে যা বিগত জোট সরকারের আমলে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়। সে সময় দুর্নীতিকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়। এ ক্ষেত্রে যেসব যুক্তি হয়েছিল তা ছিল মোটামুটি নিম্নরূপঃ

১. দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশের জিডিপির ২-৩ শতাংশ নষ্ট হয় এবং উন্নয়ন বাজেটের ৪০-৪৫ শতাংশ অপচয় হয়। সে হিসাবে দুনীতি দমন করা গেলে বাংলাদেশের জিডিপি সহজেই ৮-৯ শতাংশে উঠতে পারে।

২. বাংলাদেশের দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য দুর্নীতিকে প্রধান কারণ হিসাবে দায়ী করা হয়ে থাকে। টিআইবির রিপোর্টে পুলিশ বিভাগকে সব থেকে দুর্নীতিবাজ বিভাগগুলোর একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়লে তারা দুর্বত্তদের থেকে জনগণকে রক্ষা না করে বরং তাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করাটাই স্বাভাবিক। হয়েছিলও তাই। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা শুধু যে পুলিশের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতো তাই নয়, বরং তারা জনপ্রতিনিধি হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এমনকি সংসদে পর্যন্ত চলে এসেছিল। র‍্যাব চালুর পর তাদের দৌরাত্ম কিছুটা হলেও কমে আসে। ঘুষের দাবীতে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করে হত্যা এমনকি পুলিশ কতৃক ছিনতাই এর মত ঘটনাও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

৩. দুর্নীতির কারণে ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায় কেননা, দুর্নীতির ফল সমাজের ধনীক শ্রেণীই ভোগ করে থাকে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী অসম প্রতিযোগীতার শিকার হয়।

৪. বিগত এক দশকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির জন্য দুর্নীতিকে প্রধান কারণ হিসাবে দায়ী করা হয়। ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট তৈরী করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আটকে রেখে কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করে এবং দাম বহুগুণ বৃদ্ধি করে বিক্রয় করে। দেখা যেতো রমজানের আগে থেকে হঠাৎ করে কয়েকটি পণ্যের মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পেতো। সরকারের মন্ত্রীরা পর্যন্ত সে সিন্ডিকেটের কথা বললেও তার কোন সমাধান করতে পারে নি। দুর্নীতি অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ায় এবং দুর্নীতিবাজদের হাতে প্রচুর অবৈধ অর্থ থাকায় ব্যবসায়ীরা যে দামই হাকুক না কেন, তাতেই পণ্য বিক্রয় হয়ে যেতো। ফলে দ্রব্যমূল্য সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তাছাড়া পুলিশ ও রাজনৈতিক চাঁদাবাজদের সম্মিলিত ও পৃথক চাঁদাবাজির কারণে পরিবহন ও বাজারজাতকরণের ব্যয় অনেক বেড়ে যেতো বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ এসেছে।

৫. দুর্নীতির কারণে নাগরিকদের অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যহত হতো। যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ জমা থাকার পরও শান্তিপ্রিয় জনগণ তা কোন খাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হতো না। কোন ব্যক্তি যদি কোন উৎপাদনমুখী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে চায়, তাহলে তাকে বিভিন্ন সরকারী অফিসে যেমন দফায় দফায় ঘুষ দিতে হতো, তেমনি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পালিত দুর্বৃত্তদেরকে চাঁদা দিতে হতো। চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় হত্যাকান্ডের ঘটনাও কম ঘটে নি।

এ সকল কারণে একটি ধারণা তৈরী হয়েছিল যে দুর্নীতি দূর করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় গতির সঞ্চার হবে, প্রচুর উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে, দ্রুত দারিদ্র দূর হবে, দ্রব্যমূল্য সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে চলে আসবে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি হবে। তাই বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। সরকার অতি প্রতাপশালী দুর্নীতিবাজদেরকে একে একে গ্রেফতার করাতে সাধারণ জনগণের মধ্যে আশা জাগে যে তারা খুব শীঘ্রই তাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবে দেখতে পাবে। পূর্বের কেয়ারটেকার সরকারসমূহের সংক্ষিপ্ত সময়েও মানুষ তুলনামূলক শান্তি ও আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে বাস করতো। কিন্তু এ সরকার ক্ষমতা নেয়ার ছয় মাস হয়ে গেলেও পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয় নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণ, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কড়াই থেকে চুলার মধ্যে পড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে বিগত ছয় মাসের সাফল্যের যে দাবীতালিকা জনগণের জন্য দেয়া হয়েছে তার মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যাতে বিগত সরকার ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু এ সরকার সফল হয়েছে। এর ফলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ সহ অন্যান্য সংস্কার যে ব্যহত হতে পারে তাই নয়, বরং দুর্নীতিবাজরা আবার দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফিরেও আসতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে সাধারণ জনগণ, সেনাবাহিনী, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এমনকি অতিমাত্রায় গোলোযোগ সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও সরকার কেন সফল হতে পারছে না? কেন ইলিশের ভর মৌসূমে এ মাছটি সাধারণের ধরা ছোয়ার বাইরে, কেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেড়েই চলেছে, কেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটছে না, কেন কৃষকদেরকে সারের জন্য মারামারিতে লিপ্ত হতে হচ্ছে? এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রধান ভূমিকা রাখছে বলে ধারণা করা হচ্ছেঃ

১. দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে সরকার যে কৌশল অবলম্বন করেছে তাতে মধ্য ও ক্ষুদ্র মাপের দুর্নীতিবাজরা এমন একটি সংকেত পেয়েছিল যা তাদেরকে দুর্নীতি চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে চুনোপুটিদের বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহ নেই, বরং তারা রাঘব-বোয়ালদের নিয়ে ব্যবসা করবেন। পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন অভিযান যেভাবে চলতে থাকে তাতে এ ধারণা বিস্তার সহজ হয় যে, এ অভিযানের লক্ষ্য কেবল রাজনীতিকরা। ফলে সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতি কিংবা ব্যবসায়ীদেরর অবৈধ উপায়ে মুনাফা অর্জন কোনটাই বন্ধ হয় নি। ব্যবসায়ীরা আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগই করছেন যে দুর্নীতি বন্ধ হয়নি, শুধু পদ্ধতি পাল্টেছে। আগে সরকারী কর্মকর্তারা অফিসে বসেই ঘুষ নিতেন। এখন নাকি বাসায় গিয়ে দিয়ে আসতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে লেন-দেন সরাসরি না হয়ে কারো মাধ্যমে হয়, মধ্যস্বত্তভোগীর হিস্যা দিতে গিয়ে ঘুষের পরিমাণ বেড়ে যায়।

মধ্য ও ক্ষুদ্র আকারের দুর্নীতি বন্ধ না হওয়াতে সরকারের কোন পদক্ষেপই ঠিকমত কাজ করছে না। বিগত বছরগুলোতে ইলিশ রফতানী বন্ধ ছিল না। তারপরও এই মৌসুমে নিম্ন আয়ের মানুষেরাও ঐতিহ্যবাহী এই মাছটি চেখে দেখার সুযোগ পেয়েছে। এবার সরকার ইলিশ রফতানী বন্ধ করেছে।

বাজারগুলোতে পাহারা বসিয়েছে। তারপরও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না কেন? ধরা পড়া প্রচুর ইলিশ যাচ্ছে কোথায়? কিভাবে যাচ্ছে? সর্ষের মধ্যে ভুত যে এখনও রয়ে গেছে, ইলিশই তার বড় প্রমাণ। এই ভুতকে আবার সরকার ঘাটাতে চাচ্ছে না। সে কারণে জরুরী অবস্থার মধ্যেও পুলিশকে ছিনতাই এ লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। মধ্য ও ক্ষুদ্র আকারের দুর্নীতি বন্ধ না হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যতই বাড়ানো হোক না কেন, তার ক্রেতার অভাব হচ্ছে না। সাপ্লাই আর ডিমান্ডের পুরানো নিয়মই কাজ করছে। যে বাজারে যত বেশী পয়সাওয়ালা ক্রেতা থাকে সে বাজারে দাম ততো বেশী। সমস্যা হচ্ছে একেতো অধিকাংশেরই পকেট পর্যাপ্ত ভারী নয়, তার উপর যাদের যে পরিমাণ অর্থ থাকার কথা, তাদের কারো কারো পকেট তার থেকে অনেক বেশী ভারী। বৈধ অর্থ আর অবৈধ অর্থ খরচের প্যাটার্ন আবার ভিন্ন। ধরুণ তিন ভদ্রলোক বাজারে গেছেন। একজন বেসরকারী চাকুরীজীবি। তার মাসিক বেতন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাংলাদেশের হিসাবে মোটা বেতন। কিন্তু তাকে রীতিমত বাজেট করে সংসার চালাতে হবে। বাসাভাড়া, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল, পানি, পত্রিকা, ডিস, বুয়া মিলে বিশ হাজার, দুই সন্তানের স্কুল খরচ দশ হাজার তারা বাঁধা খরচ। এরকম আয়ের কাউকে হাজার পাঁচেক টাকা আয় কর দিতে হবে। যাতায়াত, চিকিৎসা, পোষাক ও অন্যান্য খরচ বাদ দিলে তিনি বাজার সদায়ের জন্য মাসে ৫-৬ হাজারের বেশী খরচ করতে পারবেন না। তার উপর রয়েছে বেসরকারী চাকুরীর নিরাপত্তাহীনতা। তার জন্য তাকে মাসে মাসে কিছু সঞ্চয় করতে হবে। এই ভদ্রলোকের পক্ষে হাজার টাকার ইলিশ মাছের দিকে কিভাবে তাকানো সম্ভব? একজন মাঝারি ব্যবসায়ীর কথা ধরুন। তিনি টাকা চেনেন। তার টাকা বাচ্চা পাড়ে। ফলে তিনিও যাবেন না হাজার টাকার ইলিশের দিকে। এবার একজন দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তার কথা ভাবুন। তার মাসিক বেতন পনের থেকে বিশ হাজার। কিন্তু উপরি অনেক। উপরির কোন হিসাব বা বাজেট থাকে না। তিনি বাজারে গেলে দামের তোয়াক্কা করবেন না। রাজধানীতে এ ধরণের মানুষের সংখ্যা একবারে কম নয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাদের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না।

২. দেশ যারা চালাচ্ছেন, সেই উপদেষ্টাগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে কতটুকু দক্ষ, আন্তরিক ও তৎপর তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। যেমন অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এই বলে ধমক দিয়েছেন যে তারা একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট কেন পড়েন নি। কোন সাংবাদিক কোন একটি প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট না পড়ে থাকলে তাঁকে দোষ দেয়া যায় না কিন্তু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে বলতে পারেন না যে অমুকের রিপোর্ট পড়ে দেখুন। যা পড়ার ও বোঝার তা তিনি নিজে পড়বেন, বুঝবেন এবং তাঁর মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর তাঁকেই দিতে হবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ে সরকারের উপদেষ্টারা শুধু যে বিএনপি সরকারের মত আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিচ্ছেন তাই নয় বরং তাঁরা বিষয়টি নিয়ে এতো উদাসীন যে আজ পর্যন্ত বাণিজ্য উপদেষ্টা বা উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাউকেই বাজারে তাদের চেহারা দেখাতে দেখা যায় নি। বলা হচ্ছে যে, দশজন উপদেষ্টার পক্ষে সব কিছু সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কথাটি হয়তো কিছুটা সত্য। কিন্তু উপদেষ্টারা কি তাদের সময়ের সঠিক সদ্ব্যবহার করছেন? করে থাকলে এবং তাদের দায়িত্বের প্রতি আন্তরিক হলে দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন একই সময়ে কিভাবে বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়াতে পারেন? এ সরকারের থিংক ট্যাংক সিপিডি পর্যন্ত সরকারের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কথা বলছে।

৩. কিছুদিন ধরে একটি অভিযোগ দিনে দিনে জোরালো হয়ে উঠছে যে সেনাবাহিনীর উপর সব দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সরকার বসে আছে। আমাদের দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা জাতির সব দুর্যোগেই এগিয়ে এসেছেন। বাজার নিয়ন্ত্রণে তাদের সহায়তা চাওয়া হলে তারা সাহায্যের হাত বাড়ানোই স্বাভাবিক। কিন্তু বেসামরিক প্রশাসন কি তাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড চালাচ্ছেন? প্রশাসনের স্থবিরতার বিষয়টি দীর্ঘ দিন উপেক্ষা করতে থাকলে মারাত্মক ভুল হবে।

৪. বর্তমান সরকারকে যে বিষয়গুলি সবথেকে বেশী ডুবাচ্ছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, অতিরিক্ত পরিমাণে বিদেশ নির্ভরতা। কে বা কারা সরকারের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে তারা ক্ষমতায় এসেছে কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে এবং উক্ত দেশ ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত ঋণদাতা সংস্থাগুলোর ইশারা ইঙ্গিত মত না চললে তারা ক্ষমতায় টিকতে পারবে না। এই দেশ ও সংস্থাগুলো যার ঘাড়ে চাপে তাকে শেষ করে ছাড়ে। তারা চোরকে বলে চুরি করতে আর গৃহস্তকে বলে সাবধান হতে। এভাবে দেশে দেশে তারা পরস্পর বিরোধী পক্ষকে শক্তিশালী করে তাদেরকে মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিয়েছে। তাতে তাদের লাভ হয়েছে যে অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে বিভিন্ন পক্ষ সমর্থনের জন্য তাদের কাছে ছুটে গেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাদের দ্বিমুখী নীতি ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এদের কারণে সরকারের ভাবমূর্তি ইতোমধ্যে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। এর ফল নিচ্ছে আমলা ও ব্যবসায়ীরা।

৫. শুরু থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উঠে আসছে যে তারা পত্রিকার রিপোর্ট পড়ে দেশ চালান। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ কোন রাখঢাক না রেখে তা বলেও বেড়িয়েছেন এবং একই মালিকের দুটি পত্রিকাও দাবী করেছে যে এ সরকারকে তারাই এনেছে, ফলে তাদের কথা অনুযায়ী দেশ চালাতে হবে। মতলববাজ মিডিয়া সরকারকে প্রতি নিয়ত বিভ্রান্ত করছে এবং দেশের প্রকৃত চিত্র ও জনগণের মনোভাব তাদেরকে জানতে দিচ্ছে না। এ ধরণের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকারকে সচেতন থাকতে হবে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর দাবীদার যে পত্রিকাদ্বয়, তার মালিক অতি দুর্নীতিবাজ হারিস চৌধুরীর অফিস কক্ষে, প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ে, প্রায়ই আড্ডা দিতেন বলে পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে জানিয়েছেন উক্ত সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ের একজন ব্যাক্তি। আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিবাদ চোখে পড়ে নি। স্বার্থ সিদ্ধি হয়ে গেলে এরা যে আবার ভোল পাল্টাবে না তার কিন্তু কোন নিশ্চয়তা নেই।

এ সরকারের নিকট জনগণের প্রত্যাশা অনেক। প্রত্যাশা যত বেশী হয় তা পূরণ না হলে হতাশার সম্ভাবনাও ততো বেশী থাকে। সরকারকে কোন বিদেশী শক্তির উপর ভরসা না করে দেশের জনগণের উপর নির্ভর করতে হবে এবং তাদের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টা করতে হবে। দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে কোন বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে পরিচালিত না করে আইনকে প্রকৃতই তার নিজের পথে চলতে দিতে হবে। সরকারকে সকল আকার ও প্রকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী, নির্ভয় ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার বা দুর্নীতি দমন কমিশন একটি কৌশল অবলম্বন করতে পারে। সকল উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসহ সরকারী কর্মকর্তা ও তাদের উত্তরসূরীদের সম্পদের হিসাব দুনীতি দমন কমিশনে জমা দেয়ার নির্দেশ দিতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন সবাই বুঝে যাবে যে রাজনীতির সাথে সম্পর্ক থাক আর না থাক, দুর্নীতি করলে নিস্তার নেই, তেমনি ভষ্যিতে দুর্নীতি করার পথও ঝুকিপূর্ণ হয়ে যাবে। দুর্নীতিবাজদের সংখ্যা বড় জোর কয়েক লক্ষ হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের সংখ্যা ১৪ কোটি। কয়েক লক্ষের ভয়ে সরকার যদি ১৪ কোটির বিরাগ অর্জন করেত চায়, তাহলে দুর্নীতি দমন কেন, কোন ভালো কাজই তার দ্বারা সম্ভব হবে না। তাছাড়া দুর্নীতি দমন অভিযান পরিচালনায় আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কোনক্রমেই এ অভিযানকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিসাবে দেখার বা দুর্নীতিবাজদের প্রতি জনগণের মমতা সৃষ্টির কোন সুযোগ না থাকে।